-: প্রস্তাবনা :-

আমাদের দেশে সাহিত্য নিয়ে যে পরিমাণে ও যে ধরনের গবেষণা হয়েছে তার তুলনায় ভাষা সম্পর্কে গবেষণার কাজ খুবই কম হয়েছে বলা চলে। এর কারণ যাই থাক না কেন একটা কথা অন্তত বলা যায় যে ভাষা সম্পর্কে গবেষকদের আগ্রহ খুবই নগণ্য। যদিও আমরা আমাদের পঠন পাঠনের মধ্যে ভাষাশিক্ষার একটা স্থান রেখেছি, এমন কি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সাহিত্যের পাঠ্যতালিকায় ভাষার একটি বিশেষ স্থান আছে, তথাপি লক্ষণীয় এই যে ভাষার ব্যাপারটা সাধারণভাবে তেমন গুরুত্ব পায় না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সাহিত্যের তুলনায় ভাষার ব্যাপারটা বিশেষ অনুশীলন ও পরখ সাপেক্ষ বিষয়। সত্যকার ভাষা সম্পর্কে আগ্রহের অভাব তার অন্যতম কারণ।

তথাপি আমাদের দেশে ভাষা সম্পর্কিত কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ যে হয় নি তা বলা যাবে না। স্যর গ্রীয়ার্সন ১৯০৩ সালে তাঁর 'দি লিংগুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের অবলম্বনে করে আমাদের ভাষাগুলির অনুশীলন ও চর্চার পথটি খুলে দেন। এই গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ডের প্রথম খণ্ডে (Vol.V. Part-I) বাংলা ভাষা ও উপভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে 'The origin and development of the Bengali Language' গ্রন্থটি প্রকাশ করে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার ও চর্চার নতুন একটি দ্বার খুলে দেন। অতঃপর ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ভাষার ইতিহাস প্রকাশ করে ভাষা চর্চার নতুন একটি দ্বার উন্মোচিত করেন। অতঃপর যথাক্রমে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা প্রবন্ধ চৌধুরী ও ভাষা সম্পর্কে দুয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত ভাষা ও বাংলা ভাষা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের আলোচনাগুলিও স্মরণীয় সঙ্গে স্মরণীয়। সেকালের এবং একালের এইসব - আলোচনা সাধারণভাবে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যথা ভাবে সহায়ক, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তথাপি, এইসব সূচনার দুইটায় সত্ত্বেও একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে যুক্ত ভাষা ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ এখনও রয়ে গেছে।

১৯০৩ সালে গ্রিয়ার্সন বাংলা ভাষার উপর আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম উপভাষাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং সাধুভাষায় রচিত একটি অনুচ্ছেদকে অবলম্বন করে বাংলার বিভিন্ন উপভাষায় তার রূপান্তরগুলি দেখান। সেই রূপান্তরগুলি - দেখাবার আগে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় খুব সংক্ষিপ্তভাবে তিনি বিভিন্ন উপভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনুরূপ ভাবে উপভাষা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার - ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে খুব সংক্ষেপে এই ধরনের কিছু আলোচনা করেছেন। অন্যত্রও উপভাষা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আছে। এইসব আলোচনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা চলে আসলে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার উপর এসব আলোচনা পূর্ণাঙ্গ কোন আলোচনা নয়। অথবা ঠিক মত বলতে গেলে বলতে হয় বাংলা ভাষার অন্তর্গত উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার উপর একটা গবেষণা মূলক কাজ হয় নি। অথচ ভেবে দেখলে দেখা যাবে সাধারণভাবে বাংলা ভাষার যেমন মৌলিক একটি চরিত্র আছে, বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েও এইসব উপভাষার বা আঞ্চলিক ভাষার মৌলিকত্ব ও গণ্য করার মত। যুক্ত অঞ্চলবিশেষের গ্রন্থগুলি এইসব উপভাষার বৈচিত্র্য খুবই বিস্ময়কর। এক একটি অঞ্চলবিশেষে মূল ভাষার সঙ্গে যোগ রেখেও কিভাবে এইসব আঞ্চলিকভাষা প্রবহমান হয়েছে তা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যবান সন্দেহ নেই।

মূলতঃ এই কারণেই বর্তমান গবেষণার বিষয়রূপে ঢ আমরা মালদহের আঞ্চলিক কথ্যভাষার ধ্বনি ও রীতির আলোচনায় আগ্রহবোধ করেছি। অঞ্চল বা জেলা হিসেবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা ও অঞ্চলের তুলনায় মালদহের স্বাতন্ত্র্য গণ্য করার মত। মুক্ত অতীতে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। তারপর যারা ঔন্নাম গৌড়ের

মধ্য দিয়ে সেই গোষ্ঠি মানবের মানদের ভেলায় পরিণত, সেইটি যখন বাংলায় মুসলমানী ছিল তখন থেকে মামাবাড়ির ও ঔপমাতির আগমন ঘটেছে এই মুসলমান এবং হাফিজরা - পরবর্তীকালেও এই আগমন অব্যাহত থেকে গেছে। সুতরাংই মামাবাড়ির ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে এই অঞ্চলে এমন একটি মিশ্র সংস্কৃতি ও ভাষার মূল বস্তু উঠেছে যা অস্বীকার করা যায় না। শুধুই পরব মানদের ইতিহাসই নয় মুসলমান নয়, এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষাও মুসলমান ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করছে।

বিশেষভাবে যদি ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে মানদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই অঞ্চলে মামাভাষা ভাষীর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। এখানে চৈকিল, ঘির, ভাবার, চোধাল, চাঁইমণ্ডল, মাগুরমণ্ডল, পুরকায়স্থ, রায়বংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান বসবাস করে আসছে। এরা মানদের ভেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এবং এক একটি অঞ্চলে বেশ পুরুষানুক্রমে বসতি স্থাপন করে আছে। এই ভাবেই তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ভাষাকেও অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করে আসছেন। নানা শতাব্দীর বিবর্তনের ফলে নিজেও এদের ব্যবহৃত কথ্যভাষাগুলি প্রায় অভিন্ন হয়ে গেছে। এইভাবেই বঙ্গ কথ্যভাষার সমধর্মী মানদের ভেলা একটি বিশিষ্ট ভাষাভাষী অঞ্চলরূপে চিহ্নিত হতে পারে। যদিও সাধারণভাবে বর্তমানে চলিত ভাষাই 'Standard Colloquial Bengali) এই অঞ্চলে প্রচলিত মানুষের বাহ্যিক কথ্যভাষা হিসেবে গৃহীত তথাপি সূক্ষ্মভাবে দেখা গেছে বিভিন্নের মধ্যে বাক্যালাপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক তাঁদের আঞ্চলিক কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত এমন একদিন আসবে যখন অন্যান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত এই অঞ্চলের মানুষও চলিতভাষাকেই তাঁদের * কথ্যভাষার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন। তখন হয়ত মানদের ভেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কথ্যভাষাগুলি বড় পরিমাণে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। এ দিক থেকে এইসব কথ্যভাষার আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। বস্তুতঃ বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য যা লক্ষ্য তাই।

গবেষণা - পদ্ধতির দিক থেকে আমরা একদিকে যেমন আচার্য সুনীতিকুমার প্রবর্তিত আলোচনা পদ্ধতিকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখেছি, অন্য দিকে তেমনি Leonard Bloom field - এর আঙ্গিক আলোচনা পদ্ধতিকেও অনুসরণ করেছি। আচার্য সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বাংলাভাষার এবং তার মূল ভারতীয় আর্যভাষার একটি ইতিহাস সমূহ আলোচনা করেছেন। অতঃপর

পর্যায়ক্রমে বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে Bloomfield তাঁর 'Language' গ্রন্থে বাক্যগঠনরীতি (Syntax) এবং শব্দার্থ পরিবর্তন (Semantic change) নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা আমাদের কাছে ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। Bloomfield তাঁর গ্রন্থের তৃতীয়াংশ অধ্যায়ে 'Dialect Geography' নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, পদ্ধতির দিক থেকে তাও আমাদের কাছে কথ্যভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খানিকটা সাহায্যকারী বলে মনে হয়েছে। Bloomfield আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বলেছেন - 'Non-Standard Speech' এবং এর একটি অঞ্চলকে 'Speech Area' বলে অভিহিত করেছেন। মালদহের কথ্যভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা ক্ষেত্রেBloomfield এর এইসব অভিমত বা ধারণা আমাদের গবেষণাক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। আঞ্চলিক কালে ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আচার্য মুনী চিত্তরায় Bloomfield এর আদর্শ অনুসরণেই - বর্তমান গবেষণার আলোচনা পদ্ধতিকে নীতিগত রূপদিতে চেষ্টা করেছি। এটা কতটা বা সফলতা বিচারের গণ্য হবে কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে যে অন্তত আঞ্চলিক ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আচার্য মুনী চিত্তরায়ের বা Bloomfield এর মতাদর্শের উপযোগিতা এখনও আছে। মুনী চিত্তরায়ের গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯২৫ সালে তিনি নীতিগত বলেছিলেন - "In a work of this kind, necessarily offering conclusions here and there on points which in the present state of our linguistic knowledge cannot be decided with absolute Certainty, it is not to be expected that all scholars will agree with every statement continued in it ..." -

আমাদেরও মনে হয় এই গবেষণায় নীতিগত উপাদান নিয়ে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে তা সর্বাংশে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। তবে একথা ঠিক এই গবেষণা যেহেতু মূলত সমীক্ষাভিত্তিক নিয়ে তথ্যদাতা ব্যক্তিগত সমীক্ষার উপর নির্ভর করেই মালদহ জেলার কথ্যভাষার বিভিন্ন রূপ যথাযথ ধরবার চেষ্টা করেছি। এই কাজে যতদূর দেখা গেল গ্রন্থ পত্রে Census Report - এ এবং District Gazetteer এ উল্লিখিত কিছু আলোচনা ছাড়া মালদহের ভাষা - নিয়ে তেমন কাজ হয় নি। সুতরাং কিছুটা সম্পূর্ণভাবেই এই কাজটি গড়ে নিতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (তৃতীয় সংখ্যা, অষ্টাদশ ভাগ, ১৩১৮) হরিদাস পালিত মহোদয় মালদহ জেলার ভাষা নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেই আলোচনাটি আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে। হরিদাস - পালিতের প্রবন্ধ গ্রাথমিক আলোচনা হিসেবে মূল্যবান হলেও আমাদেরকে তাঁর অভিমত গুলি সর্বাংশে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়াও অবশ্য অনেকে স্থানীয় পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু কিছু লিখেছেন। সেই সব লেখা নিঃসন্দেহে কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যবান তবে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে সেগুলি খুব বেশী সহায়ক হয় বলেই আমরা সেইসব আলোচনার প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করি নি।

অতঃপর সমগ্র আলোচনাটি কিভাবে অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। প্রথম অধ্যায়ে মালদহ জেলার প্রাচীন ইতিহাস এবং ভৌগোলিক সংস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে মালদহের একটি সংক্ষিপ্ত - ইতিহাস আলোচিত হয়েছে এবং তার ভেতর দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে নানা জাতি ও উপজাতির সমন্বয়ে এই জেলার জনজীবন গড়ে উঠেছে। তবে যেহেতু আমাদের পরবর্তী মালদহের কথ্যভাষার আলোচনা সেইজন্যই দেখানো হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায় (Speech Community) বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এই সূত্রেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মালদহ জেলার ৯ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত কথ্যভাষাগুলির সমীক্ষা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কথ্যভাষাগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্যই মূলতঃ এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ধ্বনিবিজ্ঞানের ক্রম অনুসারে কথ্যভাষাগুলির মূল্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ধ্বনিবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ক্রম অনুসারে যদিও এই আলোচনা সমস্তরে হতে পারত কিন্তু আপাততঃ এই আলোচনাটিকে এই ভাবেই সীমিত রাখতে হয়েছে। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে ব্যাপকতর আলোচনার অবকাশ রয়ে গেল।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মালদহের কথ্যভাষাগুলির রূপতাত্ত্বিক আলোচনা। স্বভাবতঃই এখানে কথ্যভাষাগুলির ব্যাকরণাত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখানো হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাক্যগঠনরীতির দিক থেকে কথ্যভাষাগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ - অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় শব্দার্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। সপ্তম অধ্যায়ে মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দের তালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে চলিতভাষার

সঙ্গে এইসব কথ্যভাষার সম্পর্ক নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছি। সবশেষে নবম অধ্যায়ে পূর্ণাপরতা যুক্তে এই গবেষনার অধিষ্ঠ সম্পর্কে একটি আলোচনা আছে। বিশেষ - ভাবে এই অধ্যায়ে মালদহের কথ্যভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ভবিষ্যৎ অধিষ্ঠ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পরবর্তী অংশটি পরিশিষ্ট - এই অংশে যথাক্রমে (১) নির্বাচিত শব্দতালিকা, (২) প্রবাদ ও প্রবচন, (৩) ধাঁধা, (৪) লোকনীতি, (৫) গ্রাম্য কাব্যে উল্লিখিত মালদহ অঞ্চলের প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের তালিকা - এই পাঁচটি অংশ সংযোজিত। যদিও মূল - আলোচনার সঙ্গে এগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই তথাপি যে এগুলি সংযোজিত করেছি তার কারণ এই যে এর মধ্যে দিয়ে মালদহের কথ্যভাষাগুলির কিছুটা বাস্তব পরিচয় - পাওয়া যাবে। ভাষা বিচারের দুটি প্রধান অঙ্গ - একটি তাত্ত্বিক (Theoritical) অন্যটি ব্যবহারিক (Practical) । পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিষয়গুলি মূল আলোচনার ব্যবহারিক অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

যদিও মূল আলোচনায় মালদহের বিভিন্ন কথ্যভাষার পৃথক পৃথক ধ্বনিগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে তথাপি এখানে প্রাথমিকভাবে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে সমগ্র আলোচনার প্রাথমিক আভাস দেওয়া হল।

চলিত (কথ্য) ভাষা
(Standard Colloquial Bengali)

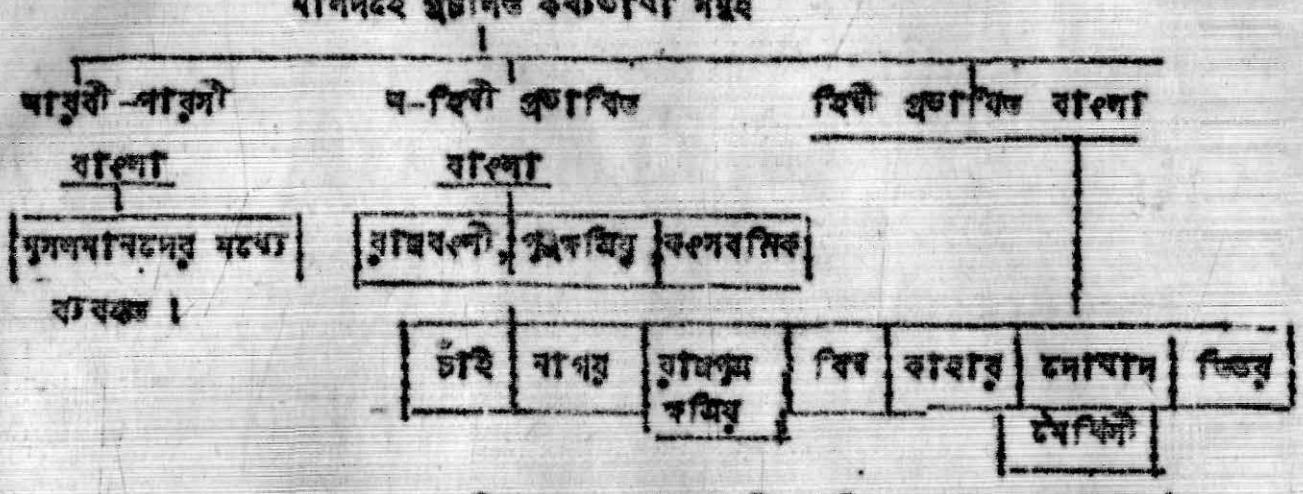

যথাস্থানে এগুলি বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় Bloomfield যাকে বলেছেন Dialect Geography সেই অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত কথ্যভাষা গুলির সংস্থান মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্রগুলি মূল আলোচনার সঙ্গে পুরী রূপে সম্পৃক্ত বলে ধরা যেতে পারে। কারণ এর ভিতর দিয়ে কথ্যভাষা গুলির ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যাবে। মূলত এদিকে গবেষণাতেই পূর্ববর্তী আলোচনা অগ্রসর হয়েছে এবং তারই ভূমিকা হিসেবে এই প্রস্তাবনাটি উপস্থাপিত করা হল।

---

১. Dr. Das S.K./Standardisation of Hindi and Bengali, Paper read out at the conference of the standardisation of Asian Languages/Pacific Linguistics/series C-No. 47/Manila, Philipines, Dec 16-21, 1974/ Page 199.

Amendment :- 2

পৃঃ ৭

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই গবেষণার আলোচনা সূত্রে ভাষা উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা --- এই তিনটি প্রত্যয় (Term) ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষা প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণভাবে যে কোন ভাষা বোঝাবার জন্য(যেমন বাংলা ভাষা)। উপভাষা প্রত্যয়টি - ব্যবহৃত হয়েছে Dialect এর প্রতিশব্দ হিসেবে। যেমন, রাঢ়ী-উপভাষা, কামরূপী উপভাষা ইত্যাদি। ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলাভাষা ক্ষেত্রে চারটি উপভাষার কথা উল্লেখ করেছেন এবং মূলত: ভৌগোলিক দিক থেকে তিনি এই বিভাগ করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা বলতে বুঝিয়েছি কোন একটি অঞ্চলে যে সব কথ্যভাষার রূপ প্রচলিত সেই সব কথ্যভাষা বা Speech Form উপভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মূল পার্থক্য এই যে উপভাষা ভৌগোলিক দিক থেকে এক একটি অঞ্চলের ভাষা প্রকৃতি। সেই ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রচলিত কথ্যভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলা যেতে পারে। যেমন মালদহ জেলা উত্তরবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে ভৌগোলিক দিক থেকে বারেন্দ্র উপভাষার অন্তর্গত। কিন্তু এই মালদহ জেলার মধ্যে আবার বিভিন্ন কথ্যভাষা প্রচলিত। যেমন, টাই, রাজবংশী, মৈথিলী, পুণ্ড্রক্ষত্রিয় ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণা গ্রন্থে পূর্বোল্লিখিত তিনটি প্রত্যয়কে এইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।